১.৭.২ বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪ খ্রি.)

মিরকাশিমের স্বাধীনতা স্পৃহা ও ক্ষমতাবৃদ্ধি ইংরেজের মনঃপুত ছিল না। কারণ পলাশির যুদ্ধের পর অর্জিত বাণিজ্যিক সুযোগ ও রাজনৈতিক দাদাগিরি হারাতে তারা প্রস্তুত ছিল না। **পি. জে. মার্শাল** মন্তব্য করেছেন যে, প্রাক্-পলাশি পর্বে ইংরেজের সমৃদ্ধির মূলে ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্য। পলাশি পরবর্তী পর্বে বাংলার বেআইনি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কোম্পানির কর্মচারী ও সেনা অফিসারদের অর্থ উপার্জনের পথ খুলে দিয়েছিল। ১৭৬২-এর ৩০ ডিসেম্বর কোম্পানির ইংল্যান্ডস্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কলকাতা কাউন্সিলকে লিখিত পত্র এ বিষয়ে আলোকপাত করে। এই পত্রে কর্মচারীদের 'নির্লজ্জভাবে দস্তকের অপব্যবহার (Shameful abuse of Dastak) সম্পর্কে নবাবের কাছে কোম্পানির বিরোধী মতামত পৌঁছে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। অবশ্য কলকাতা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা

এবং বেআইনি ক্রিয়াকলাপের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন নবাবের সাথে ইংরেজের সম্পর্ককে ক্রমেই উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে।

ইংরেজের সাথে মিরকাশিমের সম্পর্কের অবনতি ও সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। সাধারণভাবে দুটি বিষয়ের উপর প্রায় সকলেই জোর দিয়েছেন—মিরকাশিমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কোম্পানির কর্মচারীদের বেআইনি কার্যকলাপ। তবে এই দুটি কারণের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিতর্ক আছে। ঐতিহাসিক **ডড্‌ওয়েল** তাঁর *Cambridge History of India (Vol-V)* গ্রন্থে লিখেছেন যে, মিরকাশিম ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা। ইংরেজ ও নবাবের স্বার্থ ছিল পরস্পর বিরোধী। ইংরেজ চেয়েছিল নবাব তাদের অনুগত থেকে বাণিজ্যিক স্বার্থপূরণে সহায়তা করবেন। অন্যদিকে, নবাবের লক্ষ্য ছিল বাইরের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীন নবাবি পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে ইংরেজের সুবিধার দাবি নবাবের স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তাই বিরোধ ছিল অনিবার্য পরিণতি। ভারতীয় লেখক নন্দলাল চ্যাটার্জী তাঁর *Mirkasim* গ্রন্থে এই মত সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, ইংরেজের সাথে বিরোধে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রশ্নটি ছিল গৌণ এবং অজুহাত মাত্র। এই সংঘর্ষের জন্য মিরকাশিমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে দায়ী ছিল। তাঁর ভাষায় ঃ "The dispute in regard to the duties on private inland trade was neither the sole nor even the principal cause of the war with the English. He had wider and more ambitious designs when he finally determined to go to war."

ভেরেলস্ট-এর মতে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমস্যা ইংরেজের সাথে সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ কারণ হলেও, এই সংঘর্ষের পটভূমি তৈরি করেছিল নবাবের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তিনি ইংরেজের সাথে নবাবের বিরোধ ও সংঘর্ষের কারণকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন—প্রকৃত কারণ ও তাৎক্ষণিক কারণ। ভেরেলস্টের ব্যাখ্যানুযায়ী মিরকাশিমের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বিরোধের প্রকৃত কারণ। নবাব ইংরেজের সমর্থনের উপর স্থায়ীভাবে নির্ভর করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই স্বাধীনচেতনা তাঁকে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছিল। রামনারায়ণের পদচ্যুতিকে তিনি নবাবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অন্ধ ইংরেজ বিরোধিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা, তা নয়। বিহারের উপ-সুবাদার রামনারায়ণ ছিলেন অসৎ। নবাবের নির্দেশ সত্ত্বেও সরকারি হিসেব দাখিল করতে তিনি অসম্মত হন। এমতাবস্থায় নবাব তাঁকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হন। ঘটনাচক্রে এই অসৎ কর্মচারী ছিলেন ইংরেজের মিত্র। তাই তাঁর প্রতি নবাবের কঠোর অনুশাসনকে ভেরেলস্ট নবাবের অকারণ ইংরেজ বিদ্বেষ বলেই বিবেচনা করেছেন। ভেরেলস্টের ব্যাখ্যানুযায়ী সংঘর্ষের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল কোম্পানির কর্মচারীদের বেআইনি বাণিজ্য। এই সমস্যাকে অজুহাত করে নবাবের সাথে ইংরেজ কোম্পানির সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ, মিরকাশিমের সাথে ইংরেজের সংঘর্ষের পশ্চাদপটে বাণিজ্য সংক্রান্ত একটা বিরোধ অবশ্যই ছিল। কেবল বাণিজ্যগত সমস্যার ভূমিকা মুখ্য নাকি গৌণ, প্রত্যক্ষ নাকি পরোক্ষ—বিতর্ক তা নিয়েই। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ থেকে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা বোঝা সম্ভব। সম্রাট ফারুকশিয়রের ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের সনদ (Charter) দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল। এই সনদে বর্ণিত অধিকার সম্পর্কে বাংলার নবাবদের মনে সংশয় ছিল। যাইহোক, কেবলমাত্র কোম্পানি তাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্ক ছাড়ের অধিকার পাবে বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরাও তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে আইন বহির্ভূতভাবে শুল্ক ছাড়ের সুযোগ নিতে থাকে। পলাশি উত্তর বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ইংরেজ কর্মচারী, তাদের দেশীয় গোমস্তা, দালাল প্রমুখ সবাই অবাধে শুল্ক ছাড়ের সুবিধা ভোগ করতে শুরু করে। ঠিক হয়েছিল, কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী 'দস্তক' বা ছাড়পত্র প্রদান করবেন, যা দেখিয়ে কোম্পানি বিনাশুল্কে বাণিজ্য চালাবে। এক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মকর্তাদের সততার উপর নির্ভর করা হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্যও 'দস্তক' দিতে শুরু করেন। মিরকাশিমের আমলে এই অব্যবস্থা ব্যাপক হয়ে ওঠে। ফলে নবাব শুল্ক বাবদ বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা হারাতে থাকেন। কোম্পানির গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের শোষণ ক্রমশ মাত্রা ছাড়াতে থাকে। ১৭৬২'র ২৬ মার্চ লিখিত পত্রে মিরকাশিম ইংরেজ গভর্নরকে জানান ঃ "...সকল কুঠীর অধ্যক্ষ তাঁহাদের গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীসহ খাজনা আদায়কারী, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির মত ব্যবহার করেন আমার কর্মচারীদের কোনও আমলই দেন না।"[১] অন্য একপত্রে নবাব লেখেন, "তাহারা জোর করিয়া কম দামে জিনিস কেনে এবং আমার প্রজা ও ব্যবসায়ীদের উপর নানা অত্যাচার করেন। ইহার ফলে আমার দেশের ব্যবসায়ীরা ও বহু প্রজা সর্বস্বান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।" ঐ বছরই ২৬ মে'র পত্রে ভেরেল্স্ট গভর্নরকে লেখেন ঃ "সর্বত্র নবাবের কর্তৃত্ব প্রকাশ্যে অস্বীকৃত ও অপমানিত; নবাবের কর্মচারীরা কারারুদ্ধ ; নবাবের দুর্গ আমাদের সিপাহী দ্বারা আক্রান্ত।" গভর্নর ভ্যান্সিস্টার্ট সমূহ ঘটনা সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন। এমনকি কর্মচারীদের সাবধানও করেছেন। কিন্তু কর্মচারীরা তাঁর কথা অগ্রাহ্য করায় তিনি সমূহ ঘটনা বোর্ডের সভায় পেশ করেন। কিন্তু বোর্ডের সদস্যরা তাঁর বক্তব্যকে কোনো রকম গুরুত্ব দেন না।

উদ্ভূত পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝেই হোক বা মিরকাশিমের সাথে গোপন বোঝাপড়ার জন্যই হোক, ভ্যান্সিস্টার্ট বাণিজ্যসংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য পারস্পরিক আলোচনাকেই গুরুত্ব দেন। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ভ্যান্সিস্টার্ট নবাবের নতুন রাজধানী 'মুঙ্গেরে' গিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেন এবং নবাবের সাথে একটি

চুক্তি স্বাক্ষর করেন। স্থির হয়, ভবিষ্যতে কোম্পানির কর্মচারীরা অন্তর্বাণিজ্যে শতকরা ৯ টাকা হারে শুল্ক দেবে। তাছাড়া নবাবের কর্মচারীর সাথে ইংরেজ কর্মচারী বা গোমস্তার বিবাদের বিচার নবাবের আদালতে সম্পন্ন হবে। ভ্যান্সিস্টার্ট ভেবেছিলেন, সন্ধির শর্তাবলি ইংরেজগণ সহজেই মেনে নেবে। কারণ ইংরেজের শুল্কের পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে খুবই কম। যেহেতু একই ক্ষেত্রে দেশীয় বণিকদের শতকরা ৪০ টাকা হারে শুল্ক দিতে হত।

এদিকে সাধারণ ইংরেজগণ মুঙ্গের চুক্তির শর্তাবলিকে 'অপমানজনক ও বর্জনীয়' বলে ঘোষণা করেন এবং এর বিরুদ্ধে কলিকাতা বোর্ডের নিকট প্রতিবাদপত্র পেশ করেন। ভ্যান্সিস্টার্টের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বোর্ড সংশোধনসহ চুক্তিটি গ্রহণে সম্মত হয়। স্থির হয়, ইংরেজ কর্মচারীরা শুধুমাত্র লবণের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে শুল্ক দেবে। গোমস্তাদের উপর নবাবের কর্মচারীদের বিচার ক্ষমতা নাকচ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সংশোধিত শর্তাবলি নবাবের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি সমস্ত শ্রেণির অন্তর্বাণিজ্যে শুল্ক তুলে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন (১৭ মার্চ, ১৭৬৩ খ্রি.)। নবাবের এই সিদ্ধান্ত ইংরেজদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। বোর্ডের সদস্যরা ন্যায়-অন্যায় বোধ হারিয়ে দাবি তোলেন, "ইংরেজ বণিক ছাড়া আর সবার কাছ থেকে শুল্ক নিতে হবে।" ইংরেজের এহেন আচরণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মিল লিখেছেন ঃ "স্বার্থের জন্য মানুষ যে কতখানি ন্যায়-অন্যায় বিচার রহিত ও লজ্জাহীন হতে পারে, এটি তার চরম এক দৃষ্টান্ত।" এই ঘটনার পরেই ইংরেজ মিরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ঘটনার অগ্রগতি স্পষ্ট বলে দেয় যে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যসংক্রান্ত বিরোধই ছিল ইংরেজের সাথে মিরকাশিমের বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ। নবাব প্রথমদিকে ইংরেজবিরোধী ছিলেন না, একথা প্রমাণিত। ইংরেজের সমস্ত প্রাপ্য তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই মিটিয়ে দেন। কিন্তু দস্তকের অপব্যবহার এবং ইংরেজ কর্মচারী বা গোমস্তাদের স্বেচ্ছাচার কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নবাবের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তবে এই কারণে, মিরকাশিম সংঘর্ষেও যেতে চাননি। তিনি বারবার কর্তৃপক্ষকে সাবধান হতে অনুরোধ করেছেন। প্রচলিত শুল্কব্যবস্থা দেশীয় বণিকদের ধ্বংস ডেকে আনছে—এই চিন্তা নবাবকে বিচলিত করে তোলে। দেশের শাসক হিসেবে জনসাধারণের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করার কারণে কঠোর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এবারেও নবাব সংঘর্ষ চাননি। তাই জোর করে ইংরেজের কাছে শুল্ক আদায়ের পরিবর্তে দেশীয় বণিকদের উপর থেকে শুল্ক তুলে নিয়ে তিনি কূটচালে ইংরেজকে পরাজিত করেন। কিন্তু নবাবের আইনানুগ ও বাস্তববাদী সিদ্ধান্তকে বেআইনিভাবে আক্রমণ দ্বারা বন্ধ করতে চায় স্বার্থান্ধ ইংরেজ। তাই প্রখ্যাত গবেষক ও অধ্যাপক ড. বিনয় চৌধুরী বলেছেন, "অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য থেকেই বিরোধের উৎপত্তি হয়েছিল, নবাবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা-তত্ত্ব ছিল ইংরেজের

অজুহাত মাত্র।[২] নবাব যে যুদ্ধ চাননি তা ভ্যান্সিটার্টের একটি পত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।" এই পত্রে তিনি লিখেছেন ঃ 'নবাব কোনদিন আমাদের অনিষ্ট চাননি। কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই অতি সামান্য কারণে তাঁর শাসনব্যবস্থায় পদাঘাত করেছি। বহুদিন পর্যন্ত নবাব অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন।...তিনি প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু প্রতিশোধ নেননি।"

পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ অবিবেচকের মতো পাটনা আক্রমণ করলে মিরকাশিম যুদ্ধে নামতে বাধ্য হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাটনা, কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ক্ষিপ্ত নবাব বিশ্বাসঘাতক, বেইমান জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, স্বরূপচাঁদ প্রমুখকে বস্তাবন্দি করে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। ভ্যান্সিস্টার্ট স্বীকার করেছেন যে, 'তাঁর গুরুতর ভাগ্যবিপর্যের কথা মনে রাখলে এই হত্যাকাণ্ডজনিত অপরাধ গুরুতর মনে হবে না।' যাইহোক, প্রাথমিক বিপর্যয়ে ভেঙে না পড়ে মিরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সাথে যোগাযোগ করেন। তখন অযোধ্যায় মুঘলসম্রাট শাহ আলম অবস্থান করছিলেন। মিরকাশিমের উদ্যোগে তিনজনের মিলিত বাহিনী ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে সম্মত হয়। বক্সারের প্রান্তরে ইংরেজবাহিনীর মুখোমুখি হয় ত্রি-শক্তিবাহিনী (২২ অক্টোবর, ১৭৬৪ খ্রি.)। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি মনরো ত্রি-শক্তিবাহিনীকে পরাজিত করেন। শাহ আলম সুযোগমতো ইংরেজ পক্ষে যোগ দেন। সুজাউদ্দৌল্লা ও মিরকাশিম আত্মগোপন করেন। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির নিকটে অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনার মধ্যে মিরকাশিম মারা যান।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের সূচক। পলাশির যুদ্ধে নবাবের অভিজাতবর্গ ও আত্মীয়দের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকৃত শক্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়নি। মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সহজেই ইংরেজের সাফল্য এনেছিল। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে নবাব পূর্ণ উদ্যমে ও পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন। তাই এই যুদ্ধকে নির্ণায়ক লড়াই বলা যায়। **ভিনসেন্ট স্মিথ** বলেছেন, পলাশি ছিল কামানের লড়াই, কিন্তু বক্সার ছিল চূড়ান্ত যুদ্ধ। "Plassey was a cononade, while Buxar was a decisive battle."। বস্তুত বক্সারের প্রান্তরে ইংরেজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সূচনা ঘটেছিল। প্রমাণিত হয়েছিল যে, ইংরেজের প্রভাবমুক্ত থেকে বাংলা তথা ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। উপরন্তু নবাব একা নয়। এখানে ইংরেজের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল অযোধ্যার বাহিনীও। নবাবের পক্ষে ছিলেন মুঘলসম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমও। তাঁর অস্তিত্ব ছিল রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে খুবই ক্ষীণ। কিন্তু ভারতের প্রতীকী রাজনৈতিক প্রধান হিসেবে তাঁর পরাজয়ের তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে সাফল্য ইংরেজ কোম্পানিকে যে বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল,

---

History of Bengal (Vol.III), Calcutta Univ...

তা অচিরেই প্রমাণিত হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানি অর্জনের পটভূমি হিসেবে বক্সারের যুদ্ধের পরিণতি ছিল সর্বাধিক সক্রিয় উপাদান। তাই **স্যার জেমস স্টিফেন** লিখেছেন যে, ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনা হিসেবে বক্সারের যুদ্ধকে বিবেচনা করা উচিত "Buxar deserves to be considered as the origin of the British power in India".। বক্সারের সাফল্য বাংলার রাজনৈতিক চৌহদ্দি থেকে ইংরেজের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রত্যাশাকে অবশিষ্ট ভারতের বৃহত্তর অংশে সম্প্রসারিত করে। অযোধ্যার নবাব ও মুঘলসম্রাটের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ উত্তর ভারতের রাজনীতির উপর ইংরেজের প্রভাব ছড়িয়ে দেয়। বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাবের পরাজয় এবং পুতুল-নবাবের অধিষ্ঠান ইংরেজের সম্পদ-শোষণের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অতঃপর ইংরেজগণ খুশিমতো বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করে স্বদেশে নিয়ে যায়। ধ্বংসের কোলে ঢলে পড়ে বাংলার কুটিরশিল্প ও বাঙালির বাণিজ্য। অতঃপর ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলা বা ভারতের শাসনকর্তায় পরিণত হওয়াটা শুধুমাত্র 'সময়ের প্রশ্নে' দাঁড়িয়ে থাকে।